নির্বাচনে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামার বিধান বাতিলের প্রস্তাবের প্রতিবাদে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২২ অক্টোবর ২০১৭)

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে তাদের কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে। কমিশন তাদের রোডম্যাপ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের (নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দল) সাথে সংলাপও প্রায় শেষ করেছে। সংলাপে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও এসেছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হলো, গত ৮ই অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সংলাপে একটি রাজনৈতিক দল 'হলফনামা'র মত গুরুত্বপূর্ণ বিধান বাতিলের প্রস্তাব করেছে। দলটি 'নির্বাচনের আগে প্রার্থীর কাছ থেকে যে হলফনামা নেওয়া হয়, তার আর প্রয়োজন নেই' বলে দাবি করে।

আমরা মনে করি, হলফনামার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধান বাতিল চেয়ে দলটি যে অভিমত প্রকাশ করেছে, তা সত্যিই হতাশাজনক ও অনভিপ্রেত। নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত, অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি বাতিল করার ক্ষমতা কারোরই নেই, এমনকি নির্বাচন কমিশনেরও। কারণ এই প্রস্তাব ভোটারের বাক্ স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, এ দাবি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্তরায় এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠার জন্য অশনিসংকেত।

এক.

এটি আজ প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রার্থী সম্পর্কে জানার অধিকার ভোটারের মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট *ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এসেসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস* [(২০০২) ৫ এসসিসি ২৯৪] মামলায় ২০০২ সালে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন, 'আমাদের সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদে বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান ভোটারের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ভোটার মত প্রকাশ বা বাক্ স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন ভোট প্রদানের মাধ্যমে। এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য পাওয়া জরুরি। গণতন্ত্র টিকে থাকার জন্য এমপি ও এমএলএ (প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত সম্পর্কে – তাদের অপরাধসংক্রান্ত অতীত-সহ – ভোটারের (ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি তথা নাগরিকের) জানা অতি প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটিও একজন আইনভঙ্গকারীকে আইন-প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কি না, তা আগেই বিবেচনায় আনতে পারেন।'

প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। *পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া* [(২০০৩) ৪এসসিসি] মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, 'একথা সত্য যে, রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে, যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভোটাররা না জানে। তাদের 'এ' কিংবা 'বি'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার কোনো ভিত্তি থাকবে না। এধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে না।' আমরা সকলেই অবগত যে, মৌলিক অধিকার আইন করে খর্ব করা যায় না। (দেখুন: 'ভূমিকা,' *২০০৮ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্যাবলী*, প্রথমা প্রকাশনী, ২০১০)।

দুই.

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ভারতীয় উচ্চ আদালতের এই রায়গুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে ২৪ মে ২০০৫ তারিখে '*আব্দুল মোমেন চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ*' (২০০৫ সালের রিট পিটিশন নং ৫৭) মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দেন। রায়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আট ধরনের তথ্য হলফনামা আকারে সংগ্রহ এবং এগুলো গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। রায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, মামলার বিবরণী এবং নিজেদের ও নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, সম্পদ এবং দায়-দেনার তথ্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

প্রসঙ্গত, তথ্যপ্রাপ্তির এই অধিকার পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা বাদ রাখা হয়েছে। আমরা মনে করি, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও প্রার্থী কর্তৃক হলফনামা প্রদানের বিধান যুক্ত হওয়া উচিৎ। বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি সুজন আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হলফনামার মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তির দাবিতে আমাদের করা মামলার শুনানি শেষে রায় ঘোষণার দিনে হঠাৎ করেই বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি আপিল বিভাগে নিয়োগ পাওয়ায় মামলাটি এখনও সুরাহা হয়নি।

তিন.

প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আমাদের দেশে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি। আদালতের নির্দেশনাও আপনা-আপনি আসেনি। এর পেছনে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত উচ্চ আদালতে নগ্ন জালিয়াতি, আমাদের কিছু আইনজীবী ও বিচারপতির বিতর্কিত আচরণ এবং 'সুজন'-এর মতো নাগরিক সংগঠনের সক্রিয়, সাহসী ও নিরবিচ্ছিন্ন ভূমিকা। আরও জড়িত অতীতের নির্বাচন কমিশনের অসহযোগিতা। এই ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক ও ন্যাক্কারজনক।

হাইকের্টের রায়ের আগে 'সুজন'-এর উদ্যোগে ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়, যা ব্যবহার করে সারাদেশের ৫৫টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক প্রোফাইল তৈরি করে সেগুলো পোস্টার হিসেবে স্বেচ্ছাব্রতীদের সহায়তায় ইউনিয়নের প্রকাশ্য স্থানে এঁটে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ইউনিয়নগুলোতে 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশসংক্রান্ত এসব কার্যক্রম স্থানীয়

ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। পরবর্তীতে প্রশ্নপত্রটি ব্যবহার করে কয়েকটি পৌরসভা নির্বাচনেও একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং তাতেও উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এসব পৌরসভায়ও ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায় এবং অপেক্ষাকৃত ভালো প্রার্থীরা বেশি ভোট পান। এসবই ঘটে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের অনেক আগে।

ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের এসব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে জনাব আব্দুল মোমেন চৌধুরী ও তার দুই সহকর্মী বাংলাদেশ হাইকোর্টে পূর্বে উল্লিখিত রিটটি দায়ের করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন রিটের বিরোধিতা (contest) করেনি। ফলে আদালত দ্রুততার সঙ্গেই প্রার্থীদের থেকে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের এবং তা গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন।

হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর অষ্টম জাতীয় সংসদের পাঁচটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই ২০০৫, সুনামগঞ্জ-৩ আসনে। সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপ-নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এর একটি সারাংশ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে মূল হলফনামার অনুলিপি চাইলে তা প্রদানে তিনি অস্বীকৃতি জানান। অন্যান্য উপ-নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বস্তুত, কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, যেহেতু আদালতের রায়ে তথ্য না দিলে কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি, তাই প্রার্থীদের পক্ষে তথ্য প্রদান ঐচ্ছিক (directory), বাধ্যতামূলক (mandatory) নয়। উল্লেখ্য, এমনি প্রেক্ষাপটে আমরা 'সুজন'-এর উদ্যোগে তথ্য প্রদানসংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়টি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫ সালের জুলাই মাসে একটি রিট (২০০৫ সালের ৫০৬৯ নম্বর রিট) দায়ের করি।

হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর জনৈক আবু সাফার পক্ষে সম্পূর্ণ গোপনে ৩ জুলাই ২০০৫ এটির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে, ৬ এপ্রিল ২০০৬, মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেন-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চ আবু সাফার 'লিভ টু এপিল' বা আপিল আবেদন (২০০৫ সালের আপিল নম্বর ৭৬৬) গ্রহণ করেন। আবু সাফার আপিল আবেদন গ্রহণ করে মামলাটি পরবর্তীকালে শুনানির জন্য আদালত নির্দেশ দেন। আপিল আবেদন শুনানিকালে মাননীয় আদালত বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, আবু সাফা একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী এবং স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হলে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভোটারদের জানার কথা। তবে মাননীয় বিচারপতিগণ হাইকোর্টের রায়ের ওপর সাফার স্থগিতাদেশের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। প্রসঙ্গত, এসব শুনানিকালে হাইকোর্টে দায়ের করা মূল মামলার উকিলদের কাউকে অবহিত করা হয়নি, এমনকি 'কেভিয়াট' দেওয়া সত্ত্বেও।

আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে ২২ জানুয়ারি ২০০৭ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের দুই দিন আগে। ওই দিন আবু সাফার আইনজীবীগণ আদালত শীতকালীন অবকাশে যাওয়ার পর অবসরকালীন বেঞ্চের চেম্বার জজের শরণাপন্ন হন এবং বাদীদের অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ নেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, ক্যাভিয়েট দেওয়া থাকলে একতরফা শুনানি হয় না এবং আদালত সব পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, যা মাননীয় চেম্বার জজ করেননি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রায়টি ছিল সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থের পরিপন্থী। প্রসঙ্গত, রায়টি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এটি নির্বাচন কমিশনে পৌঁছে যায় এবং কমিশন অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে একই দিনে প্রজ্ঞাপন জারি করে এটি কার্যকর করে। এ থেকেও সুস্পষ্ট যে পুরো জালিয়াতির পেছনে কোনো প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধন ছিল। আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে ২২ জানুযারি ২০০৭ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের দুই দিন আগে। ওই দিন আবু সাফার আইনজীবীগণ আদালত শীতকালীন অবকাশে যাওয়ার পর অবসরকালীন বেঞ্চের চেম্বার জজের শরণাপন্ন হন এবং বাদীদের অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ নেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, ক্যাভিয়েট দেওয়া থাকলে একতরফা শুনানি হয়নি এবং আদালত সব পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, যা মাননীয় চেম্বার জাজ করেন নি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রায়টি ছিল সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থের পরিপন্থী।

আদালত স্থগিতাদেশ জারি করার পর আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে আবু সাফার প্রদত্ত ঠিকানায় তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্দ্বীপে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি তাকে খুঁজে পায়নি। তবে অনুসন্ধান থেকে জানতে পারা যায়, আপিল আবেদন ও রায় স্থগিতাদেশের আবেদনে আবু সাফার পক্ষে আদালতে দেওয়া প্রায় সব তথ্যই বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। এছাড়া আদালতের কাছে তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও গোপন করা হয়েছে। যেমন, তিনি পাকিস্তান-ফেরত একজন সাধারণ সৈনিক। যদিও মামলার আর্জিতে সন্দ্বীপের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তিনি সেখানে থাকেন না। আপিল দায়েরের অন্তত পাঁচ বছর আগে থেকেই তিনি সন্দ্বীপে যান না। এমনকি তার মায়ের জানাযায়ও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তার শিক্ষানুরাগ, দানশীলতা, সমাজকর্ম ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

এই পর্যায়ে আমরা 'সুজন' থেকে মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করি, কিন্তু আদালত তা অগ্রাহ্য করেন। একই সময়ে মূল বাদীপক্ষের আইনজীবী ড. কামাল হোসেন আবু সাফার পক্ষ থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে আপিল দায়ের এবং স্থগিতাদেশের আবেদন করার বিষয়টি আদালতের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেন। তিনি ১০ জানুয়ারি ২০০৭ অনুষ্ঠিত শুনানিতে 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলো আদালতে উত্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। ড. কামাল হোসেন ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশটিও খারিজ করার আবেদন করেন। তিনি আপিলের 'মেইন্টেনিবিলিটি' বা বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আবু সাফার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগগুলো উত্থাপনের পর্যায়ে তার কৌসুলি আজমালুল হোসেন কিউসি, মাহাবুবুর রহমানসহ অন্যান্য সিনিয়র আইনজীবী মামলা থেকে অব্যাহতি নেন।

এমনি প্রেক্ষাপটে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একটি অত্যন্ত অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। ওই দিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ড. কামাল হোসেনের আপিলের 'মেরিট' বা যৌক্তিকতার বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপন করার আগেই বিচারপতি জে আর মোদাচ্ছের হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ২০০৫ সালের হাইকোর্টের রায়টি খারিজ করে দেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ

বানোয়াট তথ্য ব্যবহার করে দায়ের করা আপিলটি গ্রহণ করেন। আদালতের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আইনজীবীরা প্রতিবাদ করেন। প্রবল প্রতিবাদের মুখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাটকীয়ভাবে রায়টি প্রত্যাহার করা হয়।

পরবর্তীতে ২৮ নভেম্বর ২০০৭ প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আবু সাফাকে আদালতে হাজির করার জন্য নির্দেশ দেন, যা তার আইনজীবীরা পালন করতে ব্যর্থ হন। যেহেতু ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে আপিলটি দাখিল করা হয়েছে, যা আইনের দিক থেকে অত্যন্ত নিন্দনীয়, তাই আদালত আপিলটি খারিজ করে দেন। লক্ষনীয় যে, সুজন-এর অনুসন্ধানী ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এ জালিয়াতির তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং বহু নাটকীয়তার পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। এভাবে উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রার্থী কর্তৃক হলফলানামা দাখিলের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

চার.

আমরা আদালতের রায়ের মাধ্যমে নির্বাচনে হলফনামা দাখিল করার যে বিধানটি পেলাম আজ আবার তা ভণ্ডুল করার অপচেষ্টা চলছে। একটি রাজনৈতিক দল অতীতের ন্যায় আবার হলফনামা প্রদানের বিধানকে ভণ্ডুল করার চক্রান্তে লিপ্ত বলে মনে হচ্ছে। জনগণের তথ্য অধিকার রহিতের এ অপচেষ্টা বর্তমানে নয়, অতীতেও বহুবার করা হয়েছিল। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলে। এ আপত্তির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সম্পদের বিবরণী প্রকাশ বন্ধের চেষ্টা চালায় (বাংলা নিউজ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩)। সেসময় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে হলফনামা কিছু দিনের জন্য সরিয়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে সুজন-এর পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকির মুখে নির্বাচন কমিশন পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামা ওয়েবসাইটে পুনপ্রকাশ করে।

যে হলফনামা বর্তমানে ব্যবহার করা হয় তা অসম্পূর্ণ এবং ভোটারদেরকে সত্যিকারর্থেই তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করতে হলে এতে আরও কিছু বিষয় যোগ করা আবশ্যক। তাই হলফনামার বিধানটি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে যদি নির্বাচন কমিশন হলফনামার ছকে পরিবর্তন এবং এগুলোর সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়।

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন থেকেই অনেক বসন্তের কোকিল, বিশেষত ব্যবসায়ীদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেখা যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ প্রচুর অর্থকড়ি ব্যয় করে মনোনয়ন বাণিজ্য ও ভোট কেনা-বেচার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে আরও বিত্তশালী হন। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের রাজনীতি আজ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু আরপিও'র ১২ ধারা অনুযায়ী হলফনামায় তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে মনোনয়নপত্র বাতিল এবং নির্বাচিত হলে নির্বাচন বাতিল হবার কথা, তাই নির্বাচন কমিশন হলফনামার তথ্য খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকেই নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখা যাবে। ফলে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া কলুষমুক্ত হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হবে। তাই আমরা মনে করি যে, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক।

আমরা মনে করি যে, হলফনামা যাচাই-বাচাই করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম* মামলায় [৪৫ ডিএলআর (এডি) (১৯৯৩)] সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে, 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশন আইনি বিধানের সাথে সংযোজনও করতে পারেন'। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত কর্তক স্বীকৃত 'অন্তর্নিহিত ক্ষমতা' (inherent power) ব্যবহার করে কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে হলফনামা যাচাই-বাছাই করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন জনস্বার্থের প্রতি কমিশনের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। প্রসঙ্গত, একই ক্ষমতা ব্যবহার করে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও, একই ধরনের তথ্য প্রাপ্তির বিধান স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও আমাদের নির্বাচন কমিশনের মত ভারতীয় কমিশনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নেই।

আমরা আরও মনে করি, হলফনামা নিয়ে নতুন বিতর্ক না তুলে রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দিকেই অধিক মনোযোগী হওয়া উচিৎ। তাদের মনে রাখতে হবে, প্রার্থীর হলফনামা কেবল জনগণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করাই নয়, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখাও। জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের বিবরণী প্রদান একটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সম্প্রতি পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন সম্পদের বিবরণী দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ২৬১ জন আইন প্রণেতাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। তারা সম্পদের বিবরণী দাখিল করলে এ বরখাস্ত প্রত্যাহার করা হবে (*প্রথম আলো*, ১৮অক্টোবর ২০১৭)। আর তাই পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন যদি এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন কেন হলফনামা যাচাই-বাছাই করে অসত্য তথ্য প্রদানকারীগণকে শনাক্ত করতে পারবে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সকল ক্ষমতায় আইনে ও আদালতের রায়ে প্রদান করা হয়েছে। এজন্য কমিশনকে অগাধ ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে।

আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত করতে হলে হলফনামার বিধান আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগী হতে হবে। **প্রথমত,** কমিশনকে হলফনামার বর্তমান ছকটিতে পরিবর্তন আনতে হবে। কেননা হলফনামার ছকটি অসম্পূর্ণ এবং এতে গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে হলফনামায় নতুন করে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করছি: ১. প্রার্থীর বয়স; ২. বিদেশি নাগরিকত্ব আছে কিনা; ৩. আয়ের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ; ৪. কারা প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীল তার বিস্তারিত বিবরণ; ৫. সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কিনা ইত্যাদি। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে হলফনামায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কমিশন আনতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই সুজন-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো সংযোজন করে একটি ছক তৈরি করেছি এবং প্রস্তাবিত খসড়া ছকটি সুজন-এর ওয়েভসাইটে রয়েছে (www.shujan.org; www.votebd.org)। **দ্বিতীয়ত,** বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। **তৃতীয়ত,** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক হলফনামার তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে এবং মিথ্যা তথ্য প্রদানকারী (যেমন, মৎসজীবী রাজনীতিবিদ) ও তথ্য গোপনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রসঙ্গত, হলফ করে মিথ্যা তথ্য দেওয়া ফৌজদারি অপরাধও বটে। একইসঙ্গে কমিশনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কমিশন হলফনামা যাচাই-বাছাই করার উদ্যোগ নিতে পারে। **চতুর্থত,** হলফনামাসহ মনোনয়নপত্র 'ইলেকট্রনিক ফাইলিং'-এর বিধান করা জরুরি, যাতে তথ্যগুলো দ্রুততার সঙ্গে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। **পঞ্চমত,** হলফনামা অনলাইনে

জমাদানের ব্যবস্থা রাখা। **ষষ্ঠত,** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হলফনামার বিধান যুক্ত করা। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত করতে হলে হলফনামার বিধান আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় সেব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগী হতে হবে।